সাইয়েদ কুতুব শহীদ

জিহাদ

সাইয়েদ কুতুব শহীদ
অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

প্রকাশক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশ দাস লেন,
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

আঃ প্রঃ ৫৪

৪র্থ প্রকাশ

রজব	১৪২০
কার্তিক	১৪০৬
নভেম্বর	১৯৯৯

বিনিময় ঃ ৭.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার ঢাকা

JEHAD

By Sayeed Qutb Published by **Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-**

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane Banglabazar Dhaka-

Price : Taka 7.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লার পথে জিহাদ

জিহাদের বিভিন্ন স্তর

ইমাম ইবনে কাইয়েম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ জা'দুল মা'দে "নবুয়াতের সূচনা থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাফের ও মুনাফিকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যবহার" শীর্ষক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। ঐ অধ্যায়ে বিজ্ঞ লেখক জিহাদের প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেনঃ সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি যে ওহী নাজিল হয়েছিল তা ছিল—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ

পড়, তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে......ইত্যাদি।

এ ছিল নবুয়াতের সূচনা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে নিজে নিজে উপরোক্ত আয়াতগুলো পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো ঐশী বাণী অপরের নিকট প্রচার করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেন— يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝

হে কম্বলাবৃত। উঠ এবং জনগণকে সতর্ক কর।

এভাবে 'ইকরা' আদেশের মাধ্যমে নবুয়াত ও "ইয়া আইউহাল মুদ্দাচ্ছির" সম্বোধনের দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তারপর তাঁকে নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দিতে বলা হয়। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাই সর্বপ্রথম নিজের নিকটাত্মীয়দের নিকট আল্লার বাণী পৌছান। তারপর তিনি প্রতিবেশীদের আরও পরে সমগ্র আরববাসীদের এবং অবশেষে বিশ্বের মানব সমাজকে লক্ষ্য করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। এভাবে প্রায় তের বছরকাল পর্যন্ত তিনি তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের মনে

খোদাভীতি সৃষ্টির প্রয়াস পান। এ সময়ে তিনি কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেননি এবং কারো নিকট জিজিয়াও দাবী করেননি। বরং ঐ সময় হাত গুটিয়ে রাখা, ধৈর্য ধারণ করা এবং সহনশীলতার পথ অবলম্বন করার জন্যেই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর তিনি হিজরতের আদেশ লাভ করেন। হিজরতের পর সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেয়া হয়। তারপর যারা রাসূল (সঃ)–এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার এবং যারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে তাদের উপর হস্তক্ষেপ না করার আদেশ অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে আল্লার দ্বীন পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দেয়া হয়। ঐ সময় কাফেরদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ প্রথম শ্রেণীতে চুক্তিবদ্ধ দল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে যুদ্ধরত দল এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল জিম্মিগণ।

যাদের সাথে আল্লার রাসূল (সঃ) পূর্বেই শান্তি চুক্তি করেছিলেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করে ততক্ষণ মুসলমানদেরও চুক্তি পালন করতে বলা হয়। যদি কোন পক্ষ কর্তৃক চুক্তি লংঘনের সন্দেহ হয়, তাহলে আল্লার নবীকে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অপর পক্ষকে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা না জানানো হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করা হয়। এতদসঙ্গে চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যেও আদেশ নাজিল হয়।

সূরায়ে তওবাতে এ তিন ধরনের নির্দেশই দেয়া হয়েছিল। ঐ নির্দেশে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল যে, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা খোদা ও রাসূল (সঃ)–এর দুশমনী করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা জিজিয়া কর প্রদান করে অথবা ইসলামের জীবন বিধান কবুল করে নেয়। ঐ সূরাতেই কাফের ও মুনাফিকদের

সাথে কঠোরভাবে জিহাদ করার আদেশ দেয়া হয়। নবী করীম (সঃ) আল্লার নির্দেশ মোতাবেক কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুক্তি–প্রমাণ পেশ ও আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সংগ্রাম করেন। ঐ সূরাতেই কাফেরদের সাথে পূর্ব সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয় এবং চুক্তিগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ প্রথম শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ করে। নবী করীম (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তিনি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং ইসলামের কোন দুশমনকে কোন প্রকারের সাহায্য দানও করেনি। আল্লাহ্ তায়ালা এসব লোকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহাল রাখার হুকুম দেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের সাথে কোন চুক্তি করা হয়নি কিন্তু তারা কখনো আল্লার রাসূলের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করেনি। এছাড়া যাদের সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্যে শান্তি চুক্তি করা হয়েছিল তাদেরও ঐ শ্রেণীতে শামিল করা হয়। এ শ্রেণীর লোকদেরকে চার মাসের সময় দান করার এবং ঐ সময়ান্তে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ জারি করা হয়।

আল্লার নবী তাই চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে হত্যা করেন এবং যারা চুক্তি লংঘন করে নাই অথবা যাদের সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্যে চুক্তি করা হয়েছিল তাদের চার মাস সময় দান করেন। আর চুক্তি পালনকারীদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক ব্যবহার করেন। ফলে, সকল লোকই ইসলাম কবুল করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তারা কুফরী পরিত্যাগ করে। অমুসলিম বাসিন্দাগণ জিজিয়া কর প্রদান করে রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে যায়। এভাবে 'সূরায়ে তওবা' নাজিল হবার পর কাফেরদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে দেখা যায়ঃ প্রথম শ্রেণীতে ছিল

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শত্রুগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে চুক্তিবদ্ধ দল এবং তৃতীয় শ্রেণীতে জিম্মিগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে মাত্র দু'টো শ্রেণীই অবশিষ্ট রইল। তারা হলো যুদ্ধরত বিরোধী দল ও জিম্মি। বিরোধী মহল সর্বদা আল্লার নবীকে ভয় করতো। এখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ঃ প্রথম শ্রেণীতে নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলিমগণ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত জিম্মিগণ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে যুদ্ধরত কাফেরগণ। আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় নবীকে মুনাফিকদের বাহ্যিক আনুগত্য মেনে নিয়ে তাদের অন্তরের কপটতাকে আল্লার হাতে ছেড়ে দেয়ার এবং যুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের সংশোধন প্রচেষ্টা জারি রাখার নির্দেশ প্রদান করেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে মুনাফিকদের জানাজা-নামাজ পড়তে, তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে অথবা তাদের অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে আল্লার দরবারে সুপারিশ করতে নিষেধ করেন। বরং আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন যে, নবী মুনাফিকদের জন্যে ক্ষমার সুপারিশ করলেও তারা ক্ষমা লাভ করবে না। কাফের ও মুনাফিক দুশমনদের সম্পর্কে এটাই ছিল আল্লার নবীর গৃহীত নীতি।

উল্লেখিত আলোচনায় অত্যন্ত সংক্ষেপে ইসলামী জিহাদের সকল স্তর উত্তমরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আলোচনায় দ্বীনি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও সুদূর প্রসারী ফলাফলের আভাস পাওয়া যায়। বিষয়টি গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনার দাবী রাখে। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ে ইঙ্গিত করছি মাত্র।

জিহাদের প্রথম বৈশিষ্ট — দ্বীনে-হকের প্রথম বৈশিষ্ট্যময় সৌন্দর্য এই যে, এ একটি বাস্তবমুখী জীবন-বিধান। এ দ্বীনের আন্দোলন মানুষকে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ই নিজের দিকে টেনে নেয় এবং

অবস্থার সাথে যেসব উপায়-উপকরণ সামঞ্জস্যশীল তা-ই আন্দোলনের কাজে ব্যবহার করে। ইসলামী আন্দোলনের সূচনাতেই বাতিল সমাজের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রচলিত সমাজের চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস জাহেলিয়াতেরই প্রভাবাধীন থাকে। জাহেলিয়াতের ভিত্তিতেই ঐ সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে উঠে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় জাহেলিয়াত সমাজের উপর সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কাজেই ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে জাহেলিয়াতের প্রতিষ্ঠিত শক্তির তুলনায় সমপরিমাণ উপায়-উপকরণ অপরিহার্য। তাই ইসলামী তাবলীগ ও প্রচারের মাধ্যমে চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন করে। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধনের জন্যে পার্থিব শক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে জিহাদ পরিচালনা করে। কারণ, ঐ জাহেলিয়াতের পরিচালিত সমাজ আকীদা ও চিন্তার বিশুদ্ধকরণ কাজে বাধা প্রদান করে। পার্থিব উপকরণ ও বিভ্রান্তিকর কর্মসূচী অবলম্বন করে মানুষকে জাহেলী সমাজের প্রতি অনুগত থাকার জন্যে বাধ্য করে। আর এর ফলে সর্বশক্তিমান আল্লার পরিবর্তে মানুষেরই নিকট মাথা নত করে বাস করা ছাড়া সমাজের আর কোনই উপায় থাকে না। তাই ইসলামী আন্দোলন পার্থিব শক্তিপুষ্ট জাহেলিয়াতের মূলোচ্ছেদ করার অভিযানে শুধুমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগকেই যথেষ্ট বিবেচনা করতে পারে না। পুনরায় জোর-জবরদস্তি করে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করা ইসলামী আদর্শের নীতি নয়। এ দ্বীনের আন্দোলন পরিচালনায় উপরোক্ত উভয় পদ্ধতিই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং উভয় পন্থাই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। কারণ মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লার বন্দেগীতে নিয়োগ করাই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

জিহাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য— ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা একটা বাস্তবমুখী আন্দোলন। এ আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে

যায় এবং প্রত্যেকটি ধাপে তার চাহিদা মোতাবেক উপকরণ সংগ্রহ করে নেয় ও পরবর্তী ধাপের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। বাস্তব সমস্যাবলীকে নিছক উত্তম নীতিমালার সাহায্যে প্রতিরোধ করার কোন অবাস্তব ব্যবস্থা এ দ্বীনে নেই এবং এ আদর্শ আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানের কিছু অপরিবর্তনীয় ছককাটা পন্থার উপরও নির্ভর করে না। যারা ইসলামী জিহাদের আলোচনা করেন এবং জিহাদের সমর্থনে কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে থাকেন, তারা এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন না। বরং তাঁরা ইসলামী আন্দোলনকে যেসব স্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়, সে স্তরগুলোও বুঝে উঠতে পারেন না। অতি স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের কোন স্তরে কোন্ কোরআনী আয়াত কি তাৎপর্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা–ও উপলব্ধি করতে পরেন না। তাই তাঁরা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে জিহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরগুলোর জগা–খিচুড়ি বানিয়ে জিহাদের আসল রূপটিকে বিকৃত করে ফেলেন এবং বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ কোরআনের আয়াতগুলো থেকে কতক সাধারণ নীতিমালা আবিষ্কার করেন। অথচ ঐ আয়াতগুলোতে নিজেদের খাহেস মোতাবেক নীতিমালা আবিষ্কারের কোনই অবকাশ নেই। তাঁরা কোরআনের প্রতিটি আয়াতকেই দ্বীনের শেষ সীমা বিবেচনা করেন। এ শ্রেণীর চিন্তা যারা করেন তারা বর্তমানের নাম–সর্বস্ব মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করে নিরাশাব্যঞ্জক পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পরাজিত মনোভাবেরই ফলশ্রুতি স্বরূপ উল্লেখিত ভূমিকা গ্রহণকরেন।

পরাজিত মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়েই তারা বলেন– "ইসলাম শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের, অনুমতি দান করে।" চরম দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁরা জিহাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে দ্বীনের মহাকল্যাণ সাধন করেছেন বলে বিশ্বাস করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জিহাদের অপব্যাখ্যা করে তাঁরা দ্বীনের বৈশিষ্ট্যই পরিত্যাগ করেছেন। দ্বীনকে তার মূল লক্ষ্য থেকে

বিচ্যুত করাই এ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করার পর ইসলাম তাগুতী শক্তির ক্ষমতা মিটিয়ে দিয়ে খোদার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে লা–শরীক আল্লার বন্দেগীতে নিয়োজিত করার লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে। অবশ্য ইসলাম জোর–জবরদস্তি করে আকীদা–বিশ্বাস পরিবর্তন করতে বলে না। বরং সে মানুষকে স্বাধীনভাবে জীবন–পথ নির্বাচনের সুযোগ দান করে এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির অত্যাচার থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্যে ঐ শাসন ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন করে। তারপরও তাকে জিজিয়া কর প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত বাসিন্দা হয়ে বাস করার সুযোগ দান করে। এর ফলে স্বাধীনভাবে ইসলামী মতবাদ গ্রহণের পথে বলপূর্বক বাধাদানকারী সকল শক্তি অপসারিত হয় এবং জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ লাভ করে।

জিহাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য— এ দ্বীনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ক্রম অগ্রসরমান দ্বীনি আন্দোলন কোন অবস্থায়ই তার মূল লক্ষ্য থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হয় না। আল্লার নবী (সঃ) আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই যখন যে স্তরে আত্মীয়–স্বজন, কোরাইশ বংশ অথবা সারা বিশ্বাবাসীকে সম্বোধন করে আহবান আহবান করেছেন তখন মূল লক্ষ্যের দিকেই তাদেরকে ডেকেছেন। সকল অবস্থায় তিনি একই বাণী প্রচার করেছেন। অর্থাৎ তিনি সকলকেই এক আল্লার দাসত্ব স্বীকার ও প্রভুত্বের অপরাপর মিথ্যা দাবীদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আহবান জানান। এ বিষয়ে কোন আপোষ বা নমনীয়তার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে একটি পরিকল্পনা মোতাবেক আন্দোলন অগ্রসর হয় এবং তা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। প্রতিটি স্তরেই প্রয়োজন মোতাবেক উপায়–উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। একথা আমরা উপরেই উল্লেখকরেছি।

জিহাদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য— চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ইসলাম মুসলিম উম্মতের সাথে অন্যান্য অমুসলিমদের সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে স্থায়ী বিধান দান করেছে।

উপরের জাদুল মা'দ গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকেই তা জানা গেছে। এ বিধানের মূলকথা হলো এই যে, 'ইসলাম' (খোদার দাসত্ব ও আনুগত্য মেনে নেয়া) একটি সার্বিক মহাসত্য এবং তা গ্রহণ করা অপরিহার্য ও সমগ্র মানব সমাজের জন্যে বাধ্যতামূলক। যারা ইসলাম গ্রহণে অপারগ বা অনিচ্ছুক তাদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের সাথে আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করা এবং ইসলামের বাণী প্রচার ও তার সম্প্রসারণের পথে রাজনৈতিক বা অন্য কোন শক্তির সাহায্য নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা। প্রতিটি মানুষের জন্যে চাপমুক্ত পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ দরকার। যদি ইসলাম গ্রহণ করতে কেহ আগ্রহান্বিত হয় তাহলে ইসলাম বিরোধী মহল সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ অথবা তাকে ইসলাম গ্রহণে কোন প্রকার বাধা প্রদান করবে না। যদি কেহ বাধা প্রদান করে তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ইসলামের কর্তব্য এবং বাধা প্রদানকারী মৃত্যুবরণ অথবা বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত এ লড়াই বিরামহীন গতিতে চলবে।

দুর্বল ও পরাজিত মনোভাবাপন্ন লেখকগণ ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যখন তাদের দৃষ্টিভংগী অনুসারে ইসলামের দেহ থেকে জিহাদের 'কলঙ্ক' মোচনের প্রয়াস পান, তখন তারা দু'টো বিষয়কে অযথা মিশ্রিত করে ফেলেন ঃ প্রথম বিষয়টি হচ্ছে জোর-জবরদস্তি ইসলাম গ্রহণ করতে কোন মানুষকে বাধ্য না করা। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা لا اكره فى الدين (দ্বীন গ্রহণে কোন জবরদস্তি নেই) ঘোষণার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট ভাষায়ই এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ইসলাম ঐ সকল রাজনৈতিক ও

পার্থিব শক্তির মূলোচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়, যেসব শক্তি মানুষ ও আল্লার মধ্যে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লার দাসত্ব গ্রহণে মানুষকে বাধা প্রদান করে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়। এ দু'টো মূলনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। তাদের মধ্যে কোথাও গোঁজামিল নেই অথবা একে অপরের বিরোধীও নয়। কিন্তু দুর্বল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ পরাজয় বরণকারী পরাভূত চিন্তাধারার দরুন এ উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে ইসলামী জিহাদকে 'আত্মরক্ষামূলক' যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করতে চায়। অথচ ইসলামী জিহাদ হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লড়াই। আধুনিক যুগে প্রচলিত যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। যুদ্ধের শর্তাবলী অথবা বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতি কোন ক্ষেত্রেই ইসলামী জিহাদের সাথে বর্তমানকালের যুদ্ধ তুলনাই হতে পারে না। ইসলামী জীবন-বিধানের প্রকৃতি, দুনিয়ায় তার ভূমিকা, আল্লাহ তায়ালা এ দ্বীনের যেসব মহান লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন এবং যে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করে তাকে সকল রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; সেগুলোর ভিতরই ইসলামী জিহাদের শর্তাবলী খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী ঘোষণা

দ্বীনে-হক একটি বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী ঘোষণা। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে এমনকি নিজের প্রবৃত্তির-দাসত্ব থেকেও মুক্তি দানই এ ঘোষণার সারকথা। আল্লাহ তায়ালার একক সার্বভৌমত্ব ঘোষণার অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে এই যে, সকল মানুষই তাঁর করুণা লাভ করার সমান অংশীদার। তাই মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব যে আকার ও যে ধরনেরই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ ঘোষণারই নাম ইসলাম। মানুষের উপর মানুষের শাসন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী শক্তিরই দাবী। অর্থাৎ যে সমাজ-ব্যবস্থায় সকল বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী কর্তৃত্ব মানুষেরই হাতে, যেখানে মানুষই

মানুষের জন্যে চূড়ান্তভাবে আদেশ-নিষেধ জারি করার ক্ষমতা ভোগ করবে, সে সমাজে কিছু সংখ্যক লোক অবৈধভাবে খোদায়ী ক্ষমতাই দাবী করে থাকে। যারা তাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয় তারা কোরআনের পরিভাষায় اربابا من دون الله (আল্লাহ ছাড়া অপরাপর রব) গ্রহণ করে থাকে। তাহলে একমাত্র আল্লার সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব ঘোষণার অর্থ দাঁড়ায়, যারা অবৈধভাবে খোদায়ী শক্তি ভোগ করছে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে পুনরায় আল্লারই হাতে অর্পণ করা এবং যারা মনগড়া আইন-বিধান রচনা করে মানুষের উপর প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদের উচ্ছেদ সাধন। কারণ তারা নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে মানব সমাজকে তাদের দাসে পরিণত করেছিল। মোদ্দাকথা, আল্লাহ তায়ালার প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করার অর্থই হচ্ছে মানুষের ওপর মানুষের সকল প্রকার শাসনাধিকার ও শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক প্রভুর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ

তিনি আসমানেও খোদা এবং জমীনেও খোদা। -জুখরুফ ঃ ৮৪

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

হুকুম ও শাসন করার অধিকার শুধু তাঁরই। তাঁর নির্দেশ এই যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব করা চলবে না। এটাই হচ্ছে মজবুতজীবন-বিধান। -ইউসুফ ঃ ৪০

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

(হে নবী) আপনি বলুন, হে আহলে–কিতাবগণ। এস আমরা এবং তোমরা একটি সাধারণ নীতিতে একমত হই। তাহলো এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কোন অংশীদার থাকার কথা বিশ্বাস করবো না এবং আল্লাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্য কোন শক্তিকেই 'রব' হিসেবে গ্রহণ করবো না। যারা একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করুন, 'সাক্ষী থাক, আমরা আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করেছি।'

খোদায়ী শাসন ব্যবস্থার উপায়

খোদায়ী সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থ গীর্জার শাসন–ব্যবস্থার মত কিছু সংখ্যক স্বনির্বাচিত 'পবিত্র' ব্যক্তিদের শাসন অথবা পৌরহিত্যবাদের মত খোদা তায়ালার প্রতিনিধিত্বের দাবীদার মুষ্টিমেয় লোকের মনগড়া শাসন–ব্যবস্থা নয়। খোদা তায়ালার শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে এই যে, খোদায়ী আইনের প্রাধান্য স্বীকৃতি লাভ করবে এবং সকল বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে খোদার দেয়া বিধানকেই চূড়ান্ত বিবেচনা করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, খোদা তায়ালার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, মানুষের বাদশাহী উচ্ছেদ করা, জালেমদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লার হাতে অর্পণ এবং মানব রচিত আইন বাতিল করে খোদা প্রদত্ত আইন প্রবর্তন নিছক তাবলীগ ও প্রচারের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে না। যারা মানুষের উপর খোদায়ী কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছে তারা নিছক প্রচার ও তাবলীগে অভিভূত হয়ে ক্ষমতা পরিত্যাগ করবে

না। যদি তা–ই হতো, তাহলে তো, আল্লার নবীগণের জন্যে আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ খুবই সহজ হতো। কিন্তু নবীগণের কাহিনীও বহু শতাব্দী ব্যাপী দ্বীনে–হকের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কোন নবীর পক্ষেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ সহজসাধ্য হয়নি।

বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ্ তায়ালাই সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী, এ বিপ্লবী বাণী প্রচারের সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া প্রভুত্বের অপরাপর দাবীদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা নিছক একটি মতবাদ, দার্শনিক তত্ত্ব বা নেতিবাচক একটি বাক্য উচ্চারণ মাত্র নয়। বরং ঐরূপ ঘোষণার লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষের উপর শরীয়তে–এলাহীর শাসন প্রবর্তন এবং শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে উদ্ধার করে লা–শরীক আল্লার দাসত্ব–গন্ডীর ভেতরে আনয়ন। সহজেই বুঝা যাবে যে, এত বড় বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্যে দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সাথে আন্দোলন শুরু করা এবং অগ্রসরমান আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে বাধা প্রদানকারী বাতিল শক্তির মোকাবিলা করা অত্যন্ত জরুরী।

ইসলাম আল্লাহ ছাড়া অপর সকল শক্তির অধীনতা থেকে মানুষের মুক্তি ঘোষণা করে। তাই মানব ইতিহাসের প্রতিটি স্তরেই ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস ও মতবাদ, পাশবিক শক্তি, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গোত্রীয় ব্যবস্থা তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। অতীতে এরূপ হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। এছাড়া ভ্রান্ত আকীদা মিশ্রিত ঈমান ও কুসংস্কারাদি মানুষের অন্তরে আসন প্রতিষ্ঠা লাভ করার ফলেও উপরোক্ত প্রতিবন্ধকগুলো আরও শক্তিশালী হয়।

তাবলীগ ও প্রচার মানুষের চিন্তা ও আকীদা–বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি করে থাকে এবং আন্দোলন পার্থিব প্রতিবন্ধকগুলোকে অপসারণ করে।

এসব পার্থিব প্রতিবন্ধকতার শীর্ষে রয়েছে রাজনৈতিক শক্তি। এ শক্তি আকীদা-বিশ্বাস, বংশ ও শ্রেণীবিভেদ, সমষ্টিগত ও অর্থনৈতিক রীতি-নীতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এভাবে তাবলীগ ও আন্দোলন মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার উপরে চারদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং নতুন জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করে। ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী মানব সমাজকে সত্যিকার স্বাধীন জীবন-যাপন করতে হলে এ উভয় পন্থাই গ্রহণ করতে হবে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বন্দেগীর তাৎপর্য

ইসলাম শুধু আরবের জন্যেই মুক্তির পয়গাম নিয়ে আসেনি। এ দ্বীনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এবং তার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে সমগ্র দুনিয়া। আল্লাহ শুধু আরবদের অথবা ইসলাম বিশ্বাসকারীদেরই প্রতিপালক নন। বরং তিনি সমগ্র বিশ্বেরই প্রতিপালক ও সংরক্ষক। তিনি সারা জগতকে সকল প্রকারের মানবীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তার সংরক্ষণ গন্ডীর আওতায় ফিরিয়ে আনতে চান। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব রচিত আইন-বিধান নিজেদের উপর চাপিয়ে নেয়াই প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব বা ইবাদত। ইসলাম তাই ঘোষণা করে যে, ইবাদত বা দাসত্ব শুধু আল্লারই জন্যে নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত বা দাসত্ব স্বীকার করে নেয়- সে নিজেকে যতই ধার্মিক বিবেচনা করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে দ্বীনের সীমারেখার বাইরে অবস্থান করছে। আল্লার রাসূল (সঃ) পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে, প্রচলিত আইন-কানুন ও শাসন-ব্যবস্থার আনুগত্য ইবাদতেরই অপর নাম। এবাদতের এ অর্থ থেকে যখন ইহুদী ও খৃষ্টানগণ নিজেদের দূরে সরিয়ে নেয় তখন থেকেই তাদেরকে মুশরিক হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইমাম তিরমিযী আদী বিন হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিকট (আদী বিন হাতেম) রাসূল (সঃ)–এর বাণী পৌঁছার পর তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে যান। কারণ জাহেলিয়াতের যুগেই তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভগ্নী এবং ঐ বংশের আরও কতিপয় ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। নবী তাঁর ভগ্নীর প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দেন এবং কিছু উপঢৌকনসহ স্বগোত্রীয়দের নিকট যাবার অনুমতি দেন। ঐ মহিলা তাঁর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে উৎসাহিত করে আল্লার নবীর সাথে সাক্ষাত করার পরামর্শ দেন। আদী এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মদীনাবাসী তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি যখন নবীর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন তখন তাঁর গলায় রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ ঝুলছিল। নবী তখন নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন ঃ

اِتَّخَذُوٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তারা তাদের পীর–পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতাদেরকে খোদার পরিবর্তে 'রব' বানিয়েনিয়েছে। –তওবা ঃ ৩১

আদী বলেন, "আমি নবী (সঃ)–এর খেদমতে আরজ করলাম, তারা ধর্ম নেতাদের ইবাদত করে না।" হুজুর জবাবে বললেন, "ধর্ম নেতাগণ যে বিষয়কে হালাল ঘোষণা করেছে, তারা সেগুলোকে হালাল মেনে নিয়েছে। অনুরূপভাবে ধর্ম নেতাগণ যেসব বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো তারা হারাম ধরে নিয়েছে। এভাবেই তারা নিজেদের ধর্মীয় নেতাদের ইবাদত করে থাকে।"

উপরোদ্ধৃত কোরআনী আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যা যা বললেন তা শরীয়তের সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় রূপ। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আইন–শাসন মেনে নেয়া এক প্রকার ইবাদত। আর

এরূপ ইবাদতে যে ব্যক্তি লিপ্ত হয় সে ইসলাম থেকে বহির্গত হয়ে যায়। এ হাদীস থেকে এ কথাও জানা গেল যে, কিছু সংখ্যক মানুষ অপর এক বা একাধিক মানুষকে 'খোদার পরিবর্তে রব' বানিয়ে নিলে সেটাও ইবাদত হিসেবেই গণ্য হয়। এ জাতীয় অবৈধ দাসত্ব ও আনুগত্য মিটিয়ে দেয়ার জন্যেই দ্বীনে–হক নাজিল হয়েছে। আর এ দ্বীনই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, আল্লার জমীনে বসবাসকারী মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অপরের দাসত্ব থেকে মুক্ত জীবন–যাপন করতে হবে।

যদি মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উপরোক্ত ঘোষণার বিপরীত অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে প্রচার ও আন্দোলন উভয় অস্ত্র হাতে নিয়ে ইসলামী আদর্শ কার্যক্ষেত্রে নেমে আসতে বাধ্য।

মানুষের ওপর অন্যায় প্রভুত্ব স্থাপনাভিলাষী ও আল্লার শরীয়ত থেকে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে শাসন প্রবর্তনকারী রাজনৈতিক শক্তির ওপরে আঘাত হানাই হবে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য। কারণ এ রাজনৈতিক শক্তি মানুষের নিকট ইসলামের বাণী পৌছানোর কাজে বাধা সৃষ্টি করে। সমাজের যেসব লোক ইসলামী আদর্শ মোতাবেক জীবন–যাপন করতে ইচ্ছুক, তারা রাজনৈতিক শক্তির বাধা সৃষ্টির ফলে মতামত পোষণের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ইসলাম তাবলীগ ও আন্দোলনের মাধ্যমে প্রভুত্ব স্থাপনাভিলাষী শক্তির উচ্ছেদ সাধন করে। যে শক্তি রাজনৈতিক হোক অথবা বংশ, গোত্র ও শ্রেণী বৈষম্যের ধ্বজাধারী হোক, তার উচ্ছেদ সাধন ব্যতীত মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না। ইসলাম তাই ঐ বাতিল শক্তির মূলোৎপাটনের পর এক নয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মানব সমাজের সত্যিকার স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করে এবং স্বাধীন জীবন যাত্রার ক্রমোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতা

বলপূর্বক মানুষের মন-মগজে আকীদা-বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়া ইসলামের লক্ষ্য নয়। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, একটি বিশেষ ধরনের নিছক আকীদা-বিশ্বাসই ইসলাম নয়। একথা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার বিপ্লবী ঘোষণাই ইসলাম। ইসলামের বাণী প্রচারের সূচনাতেই একথা পরিস্কারভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ইসলাম মানুষের ওপর প্রভূত্ব স্থাপনকারী সকল সরকার ও প্রতিষ্ঠানের মূলোৎপাটন করতে ইচ্ছুক। রাজনৈতিক গোলামী থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করার পর ইসলাম মানুষের মন ও মগজকে বাতিল শক্তির কলুষিত প্রভাব থেকে বিশুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা চালায়। এ কাজ সম্পন্ন হলে তার মুক্ত জ্ঞান-বিবেককে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। কিন্তু এ স্বাধীনতার অর্থ এটাও নয় যে, মানুষ নিজেই তার স্বার্থপর মনোবৃত্তির অথবা অন্য কোন মানুষের দাসত্ব স্বীকার করে নেবে কিংবা মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব স্থাপনকারী ব্যবস্থা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

পৃথিবীর যেখানে যেখানে যখন কোন শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে, তখনই তাকে আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব স্বীকার করে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বই জীবন বিধানের উৎস হিসেবে স্বীকৃত হতে হবে। এ আদর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার অধীনেই মানুষের ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকবে। দ্বীন, বন্দেগী ও আনুগত্য একমাত্র আল্লার জন্যে নির্দিষ্ট করার এটাই একমাত্র পথ। দ্বীন শব্দের অর্থ আকীদা-বিশ্বাসের চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে একটি বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে সোপর্দ করার নামই দ্বীন এবং ইসলামী দ্বীন ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত।

কিন্তু দ্বীনের পরিসীমা আকীদা-বিশ্বাসের চাইতেও অধিক সম্প্রসারিত। তাই ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর ব্যক্তি জীবনে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ না করেও ঐ সমাজে বসবাস করারসুযোগরয়েছে।

নিছক আত্মরক্ষার নাম জিহাদ নয়

উপরে আমরা দ্বীনের লক্ষ্য সম্পর্কে যা অবগত হয়েছি তা থেকে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, ইসলামী জিহাদ উভয় প্রকারেই শুরু হওয়া অপরিহার্য। অর্থাৎ জিহাদ বিস-সাইফ (অস্ত্রের জিহাদ) ও জিহাদ-বিল-কওল (প্রচারের জিহাদ) উভয় ধরনের জিহাদ ব্যতীত দ্বীনের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আমরা একথাও বুঝতে পেরেছি যে, বর্তমান যুগের সীমিত পরিভাষায় আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলতে যা বুঝায় ইসলামী জিহাদ ঠিক তা নয়। অবস্থার চাপে এবং পাশ্চাত্য লেখকগণের চাতুরীপূর্ণ আক্রমণের যথাযোগ্য উত্তর দানে অক্ষম এক শ্রেণীর দুর্বল-মনা লোকই ইসলামী জিহাদকে ঐ সংকীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ইসলাম একটি প্রাণবন্ত বিপ্লব। মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করানোই এর লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ইসলাম মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সংস্কার অভিযান পরিচালনা করে এবং সমাজে বিদ্যমান সকল উপায়-উপকরণ নিয়োগ করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। আর প্রতিটি ধাপে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ব্যবাহার করে পরবর্তী স্তরে পৌছুবার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

যদি ইসলামী জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আত্মরক্ষার প্রচলিত অর্থ পরিবর্তন করতে হবে এবং জিহাদ শব্দ দ্বারা স্বাধীনতা হরণকারী শক্তির জুলুম থেকে মানবতার আত্মরক্ষা বুঝতে হবে। এসব জালেম শক্তি ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক,

গোত্রীয় ও শ্রেণী বৈষম্যের রূপ ধারণ করে মানব সমাজের স্বাধীনতা হরণের প্রয়াস পায়। দুনিয়াতে ইসলামী আদর্শের আগমনের সময় ঐসব ভ্রান্ত পথগামীদের প্রাধান্য ছিল এবং আধুনিক যুগের জাহিলিয়াতও ঐ ধরনের ভ্রান্ত মত ও পথ সৃষ্টি করে রেখেছে।

আত্মরক্ষার এ ব্যাপক অর্থ গ্রহণের পর আমরা ইসলামের সঠিকরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হই। ইসলামী জিহাদ বা আত্মরক্ষার মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

"মানুষের গোলামী থেকে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা। সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, স্বার্থপর ও অত্যাচারী মানুষের কর্তৃত্ব উচ্ছেদ এবং মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে খোদায়ীবিধানপ্রবর্তন।"

এক দল লোক ইসলামী জিহাদকে নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ প্রমাণ করার জন্যে নানাবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে এবং তারা তাদের যুক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করার উদ্দেশ্যে রাত-দিন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা খুঁজে খুঁজে এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিববরণ বের করে, যাতে করে তার দ্বারা ইসলামী জিহাদকে 'ইসলামী দেশ রক্ষার' সংগ্রাম প্রমাণ করা যায়। এ শ্রেণীর লোকদের কেহ কেহ আবার শুধু আরব উপদ্বীপকেই ইসলামী দেশ বিবেচনা করে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শত্রুদল কর্তৃক আরব ভূমি আক্রান্ত হবার দরুনই সেকালে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল বলে তারা দাবী করে।

ইসলামের প্রতি অনুগ্রহভাজন এসব ব্যক্তিগণ হয় বিশ্ব-সমস্যার সমাধানে ইসলামের ভূমিকা বুঝতেই পারেনি অথবা তারা প্রতিকূল পরিবেশ ও পাশ্চাত্য লেখকদের চাতুরীপূর্ণ আক্রমণের প্রভাবে দুর্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মাত্র।

একথা কে দাবী করে বলতে পারে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) রোম ও পারস্য থেকে আক্রান্ত না হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করলে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তার রোধ করে দিতেন? এ প্রশ্নের জবাবে শুধু 'না'–ই বলতে হবে, কেননা জিহাদ ব্যতিরেকে ইসলামের প্রসার কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বহু ধরনের বাধা–বিপত্তি এ আন্দোলনের পথে প্রাচীরস্বরূপ দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে রাজনৈতিক শক্তি, বংশ ও শ্রেণীগত বৈষম্য। এ বৈষম্যের দৃষ্টিভংগি থেকে রচিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং এ সবের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ইত্যাদি সবকিছুই ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিল।

একটি বিপ্লবী বাণী উচ্চারণ করে সমগ্র বিশ্বের মানব জাতিকে স্বাধীনতা দানের ঘোষণা করার পর উপরোক্ত বাধা–প্রতিবন্ধকতার মুখে নিছক মৌখিক প্রচারের মাধ্যমে এগিয়ে যাবার ধারণা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। অবশ্য ইসলামী আন্দোলন মৌখিক প্রচারের সাহায্যও নিয়ে থাকে। কিন্তু কখন? যখন মানুষ কোন মতবাদ গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষকে সকল প্রকার চাপ ও বন্ধন থেকে মুক্ত করার পরই ইসলাম 'ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই' নীতি মোতাবেক নিছক প্রচার–মাধ্যমের সাহায্যে প্রসার লাভ করে।

ইসলামী জীবন বিধানের আহবান মানব জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার বিপ্লবী ঘোষণা। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘোষণার পর শুধু দার্শনিক আলোচনা ও দ্বীনের সৌন্দর্য বর্ণনা দ্বারা বাঞ্ছিত স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। বরং বিরুদ্ধ পরিবেশের সাথে কার্যত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে এবং ক্রম অগ্রসরমান আন্দোলন প্রতিটি স্তরে যেসব বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হয় সেগুলো দূর করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। এ ধরনের আন্দোলনই হচ্ছে জিহাদ। ইসলামী জীবন–বিধানের আবাসভূমিকে ইসলামী পরিভাষায় দারুল ইসলাম বলা হয়। এ

দারুল ইসলাম শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকুক অথবা প্রতিবেশী শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় থাকুক, এতে জিহাদের দায়িত্ব হ্রাস–বৃদ্ধি পায় না। শান্তি স্থাপনই ইসলামের লক্ষ্য কিন্তু শুধু দারুল ইসলামের সীমিত ভূখন্ডে শান্তি–শৃংখলা বহাল করে পরিতৃপ্ত থাকা এবং এ আংশিক শান্তি স্থাপন ইসলামের কাম্য নয়। ইসলাম যে শান্তি চায় তা হচ্ছে এই যে, আল্লার জমীনে সর্বত্র আল্লার দ্বীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, সকল মানুষ একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই দাসত্ব করবে এবং মানুষের উপর থেকে মানুষের সকল প্রকার কর্তৃত্ব ও. প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে মিটে যাবে। রাসূলুললাহ (সঃ)–এর পরবর্তী যুগে জিহাদের এ সর্বশেষ স্তরটিকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরগুলো প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন হবে না। কারণ ঐ স্তরগুলো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন ঃ সূরায়ে তওবা নাজিলের পর নবী করীম (সঃ) কাফেরদের সাথে তিন ধরনের ব্যবহার করেছেন ঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত কাফেরগণ ছিল প্রকাশ্য দুশমন। দ্বিতীয় দলে ছিল চুক্তিবদ্ধ কাফের গোষ্ঠী। আর তৃতীয় দলে ছিল জিম্মিগণ। চুক্তিবদ্ধ কাফেরগণ ইসলাম গ্রহণের পর শুধু যুদ্ধরত ও জিম্মি এ দু'দল কাফেরই ছিল। যুদ্ধরত কাফেরগণ সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)–কে ভয় করতো, এ জন্যে তারা সর্বদায়ই শত্রুতা করে যাচ্ছিল। এভাবে সমগ্র দুনিয়ার লোক রাসূল (সঃ)–এর দৃষ্টিতে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ঃ প্রথম ভাগে ছিলেন ঈমানদার মুসলিমগণ। দ্বিতীয় ভাগে ছিল শান্তি–চুক্তির অধীন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী জিম্মিগণ এবং তৃতীয় দলে ছিল যুদ্ধরত কাফেরগণ। ইসলামী আদর্শের প্রকৃতিই এরূপ যে, তার আন্দোলন শুরু হতেই মানুষ ঐ সব ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুর্বল মনোভাবাপন্ন ও পাশ্চাত্য লেখকদের আক্রমণের মুখে পরাজয় স্বীকারকারী মহল জিহাদের যে ব্যাখ্যা দান করে, তা ইসলামী জিহাদের বৈশিষ্ট্য থেকে বহু দূরে।

মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর প্রথম দিকে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে নিম্নের আয়াত নাজিল করেন–

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ

হাত গুটিয়ে রাখ, নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত দাও।

কিছুকাল পর নিম্ন বর্ণিত কোরআনের ভাষায় শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন–

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَّقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ۚ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ
يَّنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اَلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ
وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরও (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হচ্ছে। কারণ তারা অত্যাচারিত। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সমর্থ। তারা ঐসব লোক যাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘর–বাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তাদের 'অপরাধ' শুধু এটুকু যে, তারা আল্লাহকেই তাদের একমাত্র 'রব' বলে ঘোষণা করেছে। যদি আল্লাহ

তায়ালা একদল মানুষ দিয়ে অপর দলকে দমন না করতেন তাহলে তারা সকল খানকা, গীর্জা, উপাসনালয় ও মসজিদগুলো ধ্বংস করে দিত। অথচ ঐ ঘরগুলোতে আল্লারই জিকির হয়। যারা আল্লার সাহায্য করেন, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন– আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রান্ত (আল্লার সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য তারা) যাদের আমরা কোন ভূ-খন্ডের শাসন ক্ষমতা দান করার পর তারা সেখানে নামাজ কায়েম করে, জাকাত ব্যবস্থা প্রচলিত করে, সৎ কাজের আদেশ বা আইন জারি করে এবং অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম ফল আল্লাহ তায়ালারই হাতে। –আল হজ্জ ঃ ৩৯–৪১

এ স্তর অতিক্রম করার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারাই তরবারি ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করার আদেশ দান করা হয়–

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

তোমাদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরাও অস্ত্র ধারণ কর। –আল–বাকারা ঃ ১৯০

আর অবশেষে সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দেন–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً

আর তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেভাবে তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। –তওবা ঃ ৩৬

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ

اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না, আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বিবেচনা করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দাও যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে জিজিয়া কর দিয়ে (ইসলামী রাষ্ট্রের) অধীনতা স্বীকার করে নেয়। –তওবা ঃ ২৯

কোরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো, জিহাদে উৎসাহ দানকারী অসংখ্য হাদীস, নবী করীম (সঃ)–এর সামরিক অভিযান তথা ইসলামের পরিপূর্ণ ইতিহাসই জিহাদের ঘটনাবলীতে ভরপুর। এসব সুষ্ঠু প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে মুসলিম জনসাধারণ পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন লেখকদের জিহাদ সম্পর্কিত নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। কারণ ঐসব লেখক প্রতিকূল পরিবেশ ও পাশ্চাত্য দেশীয় চালবাজ–গ্রন্থকারদের উদ্দেশ্যেমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

যারা আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশাবলী পাঠ করেন, নবী (সঃ)–এর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং বিজয় কাহিনীতে ভরপুর ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তাঁরা কখনো একথা মেনে নিতে পারেন না যে, জিহাদ একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল, তৎকালীন পরিবর্তনশীল সমাজের জন্যেই এর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং শুধু সীমান্ত রক্ষার জন্যে লড়াই করাই ছিল স্থায়ী জিহাদের আসল উদ্দেশ্য।

জিহাদের অনুমতি দান কালে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিশ্ব–পরিচালনায় আল্লাহ তায়ালার স্থায়ী বিধান

হচ্ছে এই যে, তিনি মানব সমাজকে পংকিলতা মুক্ত রাখার জন্যে একদল লোকের সাহায্যে অপর এক দলকে দমন করে থাকেন। যথা–

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ

যদি আল্লাহ তায়ালা একদলের সাহায্যে অপর দলকে দমন না করতেন তাহলে খানকা, গার্জা, উপাসনালয় এবং যেসব মসজিদে আল্লার নাম উচ্চারিত হয় সেগুলো তারা ধ্বংস করে দিতো।

বুঝা গেল এ সংগ্রাম অস্থায়ী নয় বরং এটা একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। কারণ পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সহ অবস্থান হতে পারে না। ইসলাম যখনই আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার সংকল্প ঘোষণা করেছে, তখনই অত্যাচারী প্রভুত্বের দাবীদারগণ এ ঘোষণার বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়েছে এবং এ আন্দোলনকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী হয়নি। ইসলাম এ খোদাদ্রাহীদের উচ্ছেদ সাধন এবং সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে এ জালেমদের নির্যাতনমূলক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্যে আপোষহীন সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের এ সংগ্রাম অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলবে যতদিন পর্যন্ত না দ্বীন শুধু আল্লারই জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

মক্কীস্তরে সশস্ত্র জিহাদ নিষিদ্ধ থাকার কারণ

মক্কীস্তরে যুদ্ধ পরিহার করে দাওয়াত সম্প্রসারণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা ছিল একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অস্থায়ী কার্যক্রম। হিজরতের পরও কিছুকাল যাবত ঐ নীতি বহাল ছিল। কিন্তু প্রাথমিক

স্তরের শেষে যখন মুসলমানগণ জিহাদের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়, তখন সেটা শুধু মদীনা শহরের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল না। মদীনার নিরাপত্তার প্রশ্নও অবশ্যই ছিল। কিন্তু ওটা ছিল একটা লক্ষ্যে পৌছার উপলক্ষ মাত্র। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে মুক্ত রেখে মানুষকে সত্যিকারভাবে স্বাধীন ও মুক্ত করার সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাওয়া এবং সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করার জন্যে মদীনার প্রতিরক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল।

মক্কায় অবস্থানকালে যুদ্ধ করার অনুমতি না দেয়ার যৌক্তিকতা সহজেই অনুমেয়। আল্লার নবী বনী হাশেমের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছিলেন। তাই তিনি প্রকাশ্য ঘোষণা মারফত দ্বীনের বাণী প্রচার করতে পারতেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার ও ছোট ছোট আলোচনা-বৈঠকের মাধ্যমে তিনি জনগণের মন-মগজে প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। তাছাড়া মক্কায় কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাঁর প্রচারে অথবা জনগণের সাড়া প্রদানে বাধা সৃষ্টি করছিল না। তাই ঐ স্তরে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এ ছাড়া আরও কতিপয় কারণে মক্কায় সে সময় যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়াই সঙ্গত ছিল। আমার প্রণীত "ফি জিলালিল কোরআন" নামক তফসীর গ্রন্থে নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি ঐসব কারণ উল্লেখ করেছি-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ

তুমি কি তাদের দেখেছ, যাদের হাত নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? -আন-নিসা ঃ ৭৭

আন্দোলনের মক্কীস্তরে যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করার দ্বিতীয় কারণ মূলত এই যে, ঐ সময়ে ইসলামী আন্দোলন এক বিশেষ পরিবেশে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী বাহিনী তৈরী

করছিল। কারণ তৎকালীন পরিবেশে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করছিলেন, তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান খুবই জরুরী ছিল। যেমন– আরবগণ যেসব বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল না সে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাদের তা সহ্য করার মত মনোবল দান করা ছিল একেবারেই অপরিহার্য। নিজের বা আত্মীয়–স্বজনের উপর জুলুম–নির্যাতন হলে ধৈর্য ধারণ করা, আত্ম–অহংকার ও আত্মমর্যাদাবোধকে নিয়ন্ত্রিত করা, ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটানো অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের আকাংখা দমন করা, আত্মপূজা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে নিবৃত্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৎকালীন আরবে ইসলাম গ্রহণকারীদের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কিত ধারণা পরিবর্তন করা দরকার ছিল। কারণ জাহেলিয়াতের যুগে তাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নিজের ও স্বজনদের নিরাপত্তা বিধান। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করার জন্যে তাদের তৈরী করে তোলা ছিল খুবই জরুরী। তারা যেন উত্তেজনার বশে রাগান্বিত হয়ে দিক–বিদিক জ্ঞান হারিয়ে না ফেলে। বরং অত্যন্ত ধীর ও স্থির মস্তিষ্কে ভারসাম্যমূলক ও শালীনতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। একজন মহান নেতার আদেশে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠনের সদস্য হিসেবে কাজ করা এবং প্রতিটি বিষয়ে নেতার মতামত জেনে নিয়ে তদনুসারে কাজ করার জন্যেও তাদের ট্রেনিং দেয়া জরুরী ছিল। নেতার আদেশ ব্যক্তি বিশেষের পসন্দ না হলেও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তা মেনে চলার জন্যে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা হচ্ছিল। আরবদের জীবন গড়ে তোলার জন্যে এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণদান ছিল খুবই জরুরী। কারণ একটি সুশৃঙ্খল, উন্নত স্বভাব, সুসভ্য ও পশু–প্রবৃত্তিমুক্ত এবং গোত্রীয় বিবাদ–বিসম্বাদ বর্জিত সমাজ গড়ে তোলাই ছিল ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য।

মক্কীস্তরে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দানের পেছনে অপর একটি কারণ এ–ও হাতে পারে যে, কোরাইশগণ বংশ মর্যাদার

অহংকারে লিপ্ত ছিল। তাদের বুঝিয়ে–শুনিয়ে দ্বীনের পথে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ ছিল। লড়াই ও যুদ্ধবিগ্রহ অধিকতর শত্রুতা ও ক্রোধ বৃদ্ধির সহায়ক হতো এবং তাদের জন্মগত রক্ত পিপাসা আরও প্রবল হয়ে উঠতো। ইতিপূর্বে গোত্রীয় বিদ্বেষের ভিত্তিতে দাহিস, গাবরা ও বাসুসের যুদ্ধগুলো বছরের পর বছর ধরে চালানো হয়েছিল এবং ঐসব যুদ্ধ ক্ষেত্রে গোত্রের পর গোত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম যদি ঐ ধরনের গোত্রীয় বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হতো, তাহলে তার আদর্শিক ও দাওয়াতী আবেদন কারো মনে সাড়া জাগাতে পারতো না। বরং এক বিরামহীন রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের উপকরণ হয়ে থাকতো মাত্র। আর এ অবস্থায় তার বাণী ও মৌলিক শিক্ষা গোত্রীয় বিবাদের তলায় নিষ্পেষিত হওয়ার আশংকা ছিল।

ব্যাপকভাবে গৃহযুদ্ধের বিস্তার রোধ করা ও মক্কায় যুদ্ধ পরিহার করে চলাও অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ মুমিনদের উপর অত্যাচার করা ও তাদের আন্দোলনে বাধাদান করার জন্যে মক্কায় আইনানুগ কোন সরকার ছিল না। বরং প্রত্যেক মুসলমানের আত্মীয়–স্বজন ও স্বগোত্রী লোকেরাই তাদের দাওয়াতের কাজে বাধা দিচ্ছিল এবং তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় যুদ্ধ করার অনুমতি দিলে প্রত্যেক পরিবারেই একটি যুদ্ধক্ষেত্র কায়েম করা হতো। আর গৃহযুদ্ধের এ ধারা অব্যাহত গতিতে চলতো। বিরোধী মহল এ প্রচারণা চালানোর সুযোগ লাভ করতো যে, ইসলাম গৃহ বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় প্রচারণা শুরু করাও হয়েছিল। হজ্জের সময় দূর–দূরান্তর থেকে যেসব লোক মক্কায় হজ্জ অথবা ব্যবসা করার জন্যে সমবেত হতো, তাদের নিকট কোরাইশ দলপতিগণ গিয়ে বলতো, "মুহাম্মাদ শুধু নিজের গোত্রের মধ্যে বিভদ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, সে পিতা–পুত্রের মধ্যেও বিবাদ বাঁধিয়ে দিয়েছে।" অথঁচ সে সময় দুশমনদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ

নিষিদ্ধ ছিল। যদি পুত্রকে ইসলাম বিরোধী পিতার এবং দাসকে দ্বীনের দুশমন মনিবের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অনুমতি দেয়া হতো, তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ অপপ্রাচার করা হতো এবং বাস্তব ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হতো তা বলা কঠিন ছিল।

আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন যে, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা অতিমাত্রায় তৎপর এবং মুসলমানদের প্রতি যারা নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে ঈমান আনয়ন করে ইসলামের একনিষ্ঠ সৈনিকে পরিণত হবেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কি তাদেরই একজন নন? এ জন্যেও যুদ্ধ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

যুদ্ধ পরিহার করার অপর একটি কারণ এ–ও হতে পারে যে, গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী আরবদের মন–মেজাজ এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে, জুলুম–নির্যাতনের মুখে অটল মনোভাব প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতো। গোত্রের সম্ভ্রান্ত ও সৎস্বভাব লোকদের বেলায় এ মনোভাব আরও বেশী প্রবল ছিল। অসংখ্য ঘটনাবলী থেকে আমাদের একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মত সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র ব্যক্তি মক্কা থেকে হিজরত করতে উদ্যত হলে ইবনে আদ–দাগনা তা বরদাস্ত করতে পারেনি। তাই সে হযরত আবু বকর (রাঃ)–কে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কারণ এরূপ ব্যক্তির দেশ ত্যাগকে ইবনে আদ–দাগনা আরব সমাজের জন্যে মর্যাদা হানিকর বিবেচনা করতো। তাই সে হযরত আবু বকর (রাঃ)–কে আশ্রয় দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। যে চুক্তির মাধ্যমে বনি হাশেমকে আবু তালেব উপত্যকায় অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল তা ছিন্ন করার মধ্যেও আমাদের একথারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বনি হাশেম গোত্রের অনাহার ও দুঃখ–কষ্ট তীব্র আকার ধারণ করায় আরব

যুবকেরাই ঐ চুক্তি–পত্র ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। প্রাচীন আরব সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্যাতিতের প্রতি তাদের মনে সহানুভূতি জাগ্রত হতো। অথচ সমসাময়িক আরবদের সমাজে অত্যাচারের মুখে ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হতো এবং অত্যাচারীগণকে সম্ভ্রমের চোখে দেখা হতো।

আর একটি কারণ এই যে, সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং ইসলামী দাওয়াত তখনো মক্কার বাইরে প্রসার লাভ করেনি। কোন কোন এলাকায় এ সম্পর্কে মাত্র ভাসা ভাসা খবর পৌছে। অপরাপর গোত্রের লোকেরা বিষয়টিকে কোরাইশ বংশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে বিবাদের ফলাফল কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় যুদ্ধ–বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হলে স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের জামায়াতটি নিচিহ্ন হয়ে যাবার আশংকা ছিল। যদিও তাঁরা নিজেদের সংখ্যার চাইতে কয়েকগুণ বেশী সংখ্যক দুশমনদের হত্যা করতে সক্ষম ছিলেন তথাপি তাঁদের নিজেদের জীবিত থাকার সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। কারণ সংখ্যায় তাঁরা খুবই কম ছিলেন। অসময়ে যুদ্ধ শুরু করার পরিণতি স্বরূপ তাঁদের সকলের জীবন নাশ হলে শিরক যথাস্থানে বিরাজমান থাকতো এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কখনো বাস্তবায়িত হতে পারতো না। কিন্তু ইসলাম দুনিয়াতে বাস্তবায়িত হবার জন্যেই এসেছে। তাই যথাসময়ের আগে যুদ্ধ শুরু করে দেয়া সঙ্গত ছিলনা।

হিজরতের পরও কিছুকাল সশস্ত্র যুদ্ধ পরিহার

ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র মদীনায় স্থানান্তরিত হবার পরও কিছু কাল যাবত যুদ্ধ–বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদী এবং মদীনার ভিতরে ও উপকণ্ঠে বসবাসকারী মুশরিক আরবদের সাথে সম্পাদিত এক চুক্তিনামায় পরস্পরের প্রতি আক্রমণ না করার

প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। আন্দোলনের এ স্তরে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণই ছিল অত্যন্ত জরুরী। এ চুক্তি পত্রের পটভূমিকা ছিল নিম্নরূপঃ

প্রথমত, মদীনায় ইসলামের বাণী প্রচার ও মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মদীনায় কোন রাষ্ট্রশক্তি না থাকায় জনগণের মতামত গ্রহণ ও বর্জনে হস্তক্ষেপ করার উপযোগী কোন শক্তি ছিল না। মদীনার সকল অধিবাসীই নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং তাদের সকল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে আল্লার নবীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। তাই চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আল্লার নবীর বিনানুমতিতে মদীনার কোন অধিবাসীই বাইরের কারো সাথে শান্তিচুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণা অথবা অন্য কোন প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। এমতাবস্থায় মদীনার রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলিম নেতৃত্বেরই হাতে ছিল এবং সেখানে মতামত প্রকাশেরও পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করছিল।

দ্বিতীয়ত, রাসূল (সঃ) এ স্তরে সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করে কোরাইশদের বিরোধিতার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কারণ ঐ বংশের বিরোধিতা অন্যান্য গোত্রের লোকদের দ্বীন গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা কোরাইশদের "এ আভ্যন্তরীণ বিবাদ"-এর পরিণতি দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) কালক্ষেপ না করে বিভিন্ন দিকে ছোট ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করেন। সর্বপ্রথম তিনি যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন তার সেনাপতি ছিলেন হযরত হামজা (রাঃ) ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

হিজরতের পর ছ'মাস উত্তীর্ণ হতে না হতেই রমজান মাসে এ বাহিনী প্রেরিত হয়েছিল। এ বাহিনীর পর নবী মুহাম্মাদ (সঃ) ক্রমাগত একটির পর একটি সৈন্যদল প্রেরণ করতে থাকেন। একটি হিজরতের

পর, দ্বিতীয়টি তের মাস পর এবং তৃতীয়টি ষোড়শ মাসের শুরুতে। হিজরতের পর সপ্তদশ মাসের প্রারম্ভে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরিত হয় এবং এ অভিযানেই রক্তপাত সংঘটিত হয়। সেটি ছিল রমজান মাস–আরবের স্বীকৃত নীতিমালা অনুসারে ঐ মাসে যুদ্ধ–বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এ সম্পর্কে কোরআনে করীমে নিম্নলিখিত ভাষায় আলোচনা রয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ، قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ، وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ،

আপনাকে (হে নবী) নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। বলুন, ঐ সময় যুদ্ধ করা দোষণীয় কিন্তু মানুষকে আল্লার পথে জীবন যাপনে বাধাদান, আল্লার প্রতি কুফরী করা, খোদার বান্দাদের জন্যে মসজিদুল হারামে আগমনের পথ বন্ধ করে দেয়া এবং হেরেম শরীফের বাসিন্দাদের সেখানে থেকে বিতাড়িত করা আল্লার নিকট অধিকতর দোষণীয়। এসব অত্যাচার রক্তপাতের চাইতেও জঘন্য। –বাকারা ঃ ২১৭

হিজরতের পর দ্বিতীয় বছরেই রমজানুল মোবারক মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সূরায়ে আনফালে এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে।

•

ইসলামী আন্দোলনের এ স্তর সম্পর্কে সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক লড়াই আখ্যাদেয়ার কোনই সংঙ্গত কারণ নেই। এটা শুধু পাশ্চাত্য দেশীয় বিভ্রান্তকারী লেখকদের আক্রমণে প্রভাবিত চিন্তাবিদদেরই অপকীর্তি।

ইসলামের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসার দরুন তারা গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে দুর্বল ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এ সুযোগেই ইসলাম বিরোধী পাশ্চাত্যের লেখক মহল ইসলামী আদর্শের প্রতি আক্রমণের পর আক্রমণ চালায়। আর তাদের প্রবল আক্রমণের তীব্রতা অনুভব করেই দুর্বল–মনা মুসলমান নামধারী একদল 'গবেষক' ইসলামী জিহাদকে 'আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ' হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়। আল্লাহ তায়ালারই মহান অনুগ্রহে একদল দৃঢ়চেতা মুসলমান এসব অপপ্রচারের প্রভাব থেকে মুক্ত রয়েছেন এবং তাঁরা সদর্পে ঘোষণা করছেন যে, মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অপর সকল কর্তৃত্বের গোলামী থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্তিদান এবং দ্বীনকে শুধু এক ও অদ্বিতীয় আল্লার জন্যে নির্দিষ্ট করাই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু এ স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকল তথাকথিত চিন্তাবিদই ইসলামী জিহাদের স্বপক্ষে নৈতিক কারণের যুক্তি দেখিয়ে বিরোধী মহলের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টায় তৎপর রয়েছেন। কিন্তু ইসলামী সমরনীতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে যে উক্তি করেছেন তার উপর আর কোন যুক্তি পেশ করার অবকাশ নেই।

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَنْ
يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ

سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

আল্লার পথে লড়াই করার যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন তাঁরা যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। আর যারা আল্লার পথে সংগ্রাম করেন তারা বিজয়ী হোক অথবা নিহত, উভয় অবস্থায়ই আমরা তাদের প্রচুর পরিমাণ পুরস্কার দান করবো। তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লার পথে সংগ্রাম করছো না অথচ অসহায় অবস্থায় পতিত কত পুরুষ, নারী ও শিশু আল্লার নিকট ফরিয়াদ করে বলছে, "প্রভু! এ জনপদ থেকে আমাদের উদ্ধার কর। এখানকার অধিবাসীরা জালেম। আর আমাদের জন্যে তোমারই পক্ষ থেকে একজন উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও।" ঈমানদার তারা যারা আল্লার পথে জিহাদ করে। আর যারা কাফের তারা জিহাদ করে তাগুতের পথে। তোমরা শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও। শয়তানের সকল চক্রান্তই প্রকৃতপক্ষেদুর্বল। –আল –নিসাঃ ৭৪–৭৬

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

(হে নবী) কাফেরদের বলে দাও, তারা এখনও যদি (সুপথে) ফিরে আসে তাহলে আগে যা কিছু হয়ে গেছে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু

তারা যদি (পূর্বের আচরণের) পুনরাবৃত্তি করে তাহলে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর পরিণতি সকলেরই জানা আছে। হে ঈমানদারগণ। কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও, যে পর্যন্ত না ফেতনা সম্পূর্ণরূপে মিটে যায় এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দ্বীনই অবশিষ্ট তাকে। অতঃপর যদি তারা ফেতনা থেকে বিরত হয়, তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তায়ালাই তাদের সকল কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন। আর যদি তারা অমান্য করে তাহলে (হে নবী!) মনে রেখো যে, আল্লাহই তোমার পৃষ্ঠপোষক এবং উত্তম সাহায্যকারী। –আনফাল ঃ ৩৮–৪০

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সেসব লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না। আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা পরিত্যাগ করে না এবং দ্বীনে–হককে তাদের জীবন–বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। তারা যে পর্যন্ত না

নতি-স্বীকার করে ও স্বহস্তে জিজিয়া কর দানে সম্মত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করে যাও। ইহুদীগণ বলে, ওজায়ের আল্লার পুত্র আর খৃষ্টানরা মসীহকে আল্লার পুত্র আখ্যা দিয়ে থাকে। এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা তাদের পূর্ববর্তী বিপথগামীদের কথাবার্তারই পুনরুক্তি মাত্র। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, এরা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে! তারা আল্লার স্থলে তাদের ধর্মযাজক ও পুরোহিতগণকে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মরিয়মের পুত্র মসীহকেও। অথচ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী করতে তাদের আদেশ দেয়া হয় না। তিনি ছাড়া বন্দেগী করার যোগ্যও কেউ নেই। তারা যেসব মুশরিক-সুলভ কথাবার্তা বলে সেগুলো থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তারা আল্লার প্রদীপকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাফেরদের নিকট অসহনীয় হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর দ্বীনের আলোক-বর্তিকাকে পূর্ণত্ব দান থেকে বিরত হতে পারেন না।

উপরের আয়াতগুলোতে জিহাদের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত দ্বীনে-হককে মানুষের জীবনে রূপায়িত করা, সকল প্রকার শয়তানী শক্তি ও শয়তান রচিত জীবন-বিধানের উচ্ছেদ সাধন এবং মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্বের অবসান করা-ই জিহাদের লক্ষ্য। মানুষ শুধু মাত্র আল্লার দাসত্ব করার জন্যেই সৃষ্ট। সুতরাং কোন মানুষেরই মানুষের উপর প্রভুত্ব কায়েম করা ও নিজের ইচ্ছা মাফিক আইন-বিধান জারি করার অধিকার নেই। উপরে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হলো সেগুলো জিহাদ শুরু করার দাবী পেশ করে। একই সাথেই لا اكره فى الدين (দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই) আয়াতাংশের নির্দেশও মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার পর একমাত্র আল্লারই প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব

থেকে মুক্তি লাভ করার পর একমাত্র আল্লারই প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দ্বীন একমাত্র আল্লারই হবে। কোন মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জবরদস্তি করা যাবে না।

জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে যা জানা গেল তা হচ্ছে এই যে, ইসলাম মানুষের জন্যে সত্যিকার স্বাধীন–জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যেই জিহাদের কর্তপন্থা পেশ করেছে। আর মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে খোদা তায়ালার দাসত্বে নিয়োগই পূর্ণস্বাধীনতার বাস্তব রূপ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া মানুষ অন্য কোন শক্তির সামনেই মাথা নত করতে পারে না। এ একটি কারণই কি জিহাদ শুরু করার জন্যে যথেষ্ট নয়? তাই মুসলিম মুজাহিদগণ সর্বদা উপরে বর্ণিত মনোভাবের বশবর্তী হয়েই জিহাদের অংশ গ্রহণ করতেন। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের পশ্ন করা হলে কোন মুজাহিদই বলতেন না "আমার দেশ বিপন্ন তাই যুদ্ধ করছি" অথবা "পারস্য এবং রোম আমাদের আক্রমণ করেছে তাই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে লড়াই করছি" অথবা "আমরা রাজ্য বিস্তার ও গনীমতের সম্পদ হস্তগত করার জন্যে যুদ্ধ করে চলছি।" অপরদিকে রাবি ইবনে আমের, হোজায়ফা ইবনে মুহসিন এবং মুগীরা বিন শায়রা পারস্য সেনাপতি রুস্তমের প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তারাও তা–ই বলতেন। কাদেসীয়ার যুদ্ধের তিন দিন পূর্ব পর্যন্ত সেনাপতি রুস্তম উপরোক্ত তিনজন মুজাহিদকে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমরা কি উদ্দেশ্যে লড়াই করতে এসেছ? তাঁরা উত্তরে বলেন–

"আল্লাহ তায়ালা আমাদের হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেন মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার প্রভূত্বের অধীনে আনয়ন করি, সংকীর্ণতার গন্ডি থেকে বের করে এনে তাদেরকে যেন পৃথিবীর সুপ্রশস্ত ময়দানে নামিয়ে দেই এবং বাতিল ধর্মীয়

অনুশাসনের নির্যাতন থেকে রেহাই দিয়ে তাদেরকে যেন ইসলামী ন্যায়-নীতির সুশীতল ছায়াতলে স্থান করে দেই। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা নবীকে জীবন-বিধান সহকারে মানুষ সমাজে প্রেরণ করেছেন।

যারা আমাদের উল্লেখিত জীবন-বিধান কবুল করে নেয় আমরা তাদের স্বীকারোক্তি মেনে নিয়ে ফিরে যাই এবং তাদের দেশ তাদের হাতে প্রত্যার্পণ করি। আর যারা আল্লার দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাই এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা শাহাদত বরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করি অথবা দুশমনের উপর আমাদের বিজয় সূচিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ লড়াই অব্যাহত রাখি।"

জিহাদের আরও একটি কারণ

ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাবধারার মধ্যেই জিহাদের উল্লেখিত কারণগুলো দৃঢ়মূল হয়ে আছে। অনুরূপভাবে ক্ষমতালিপ্সু মানুষের দাসত্ব থেকে বিশ্বজনীন আজাদীর ঘোষণা, মানব সমাজে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতির সার্বিক মোকাবেলা এবং অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে যথাযোগ্য উপায়-উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় এ দ্বীনের বাস্তব চাহিদারই অন্তর্ভুক্ত। এ দ্বীনের দাওয়াত উচ্চারণের মধ্যেই জিহাদের ঘোষণা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকুক বা না-ই থাকুক, সে জন্যে তার জিহাদী ভাবধারার কোনই পরিবর্তন হতে পারে না। অনৈসলামিক সমাজের বিরাজমান অবস্থা এবং ইসলামী আন্দোলনের সূচনা উভয়ই পরস্পরের প্রতি সংঘর্ষশীল। তাই জিহাদ শুধু দেশরক্ষা অথবা আত্মরক্ষা সাময়িক প্রয়োজনের সীমিত কার্যক্রম নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভ চরিতার্থ করার জন্যে কোন মুসলমানই নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করে জিহাদের অংশ গ্রহণ করে না।

জিহাদের ময়দানে পদক্ষেপ নেয়ার আগেই মুজাহিদকে অপর একটি বিরাট জিহাদে জয়ী হতে হয়। সেটি হচ্ছে তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তান, তার নিজের কামনা-বাসনা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখ-সুবিধা, তার পরিবার ও স্বজাতির স্বার্থের প্রশ্ন এবং এ জাতীয় অপরাপর বিষয় যেগুলো আল্লার বন্দেগী করতে ও পৃথিবীতে আল্লার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এগুলোর বাধা অতিক্রম করার পরেই মর্দে-মুমিন জিহাদের ময়দানে অবতরণ করতে পারে। আর সমাজে ইসলামের বিপরীত যত প্রকারের শ্লোগান ও মতবাদের আন্দোলন বিদ্যমান থাকে তাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালিয়ে বাতিল প্রভুত্বের উচ্ছেদ ও খোদায়ী শাসন প্রবর্তনের মহান প্রেরণাই মুমিন-মুজাহিদগণের জীবনের লক্ষ্য।

ইসলাম ও দেশরক্ষা

যারা ইসলামী জিহাদকে দেশের প্রতিরক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে রাখতে আগ্রহান্বিত তারা ইসলামী জীবন-বিধানের মহত্ব হ্রাস করতে চায়। তারা বলতে চায় যে, ইসলামী আদর্শ মাতৃভূমির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। মাতৃভূমি ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়কে অনৈসলামিক জীবন-বিধান যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে, ইসলাম তা সমর্থন করে না। তাদের এ দৃষ্টিভংগী আধুনিক যুগের পরিবেশে জন্মলাভ করেছে। এ দৃষ্টিভংগী ও অনুভূতি ইসলামী আদর্শের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যশীল নয়।

ইসলামী জীবনাদর্শের আলোকে দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণই ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য অথবা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনকারী জীবন-বিধানের সংরক্ষণ কিংবা ঐ আদর্শ জীবন-বিধান সংরক্ষণই ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য। ইসলামের নিকট ভূ-খন্ডের কোন মূল্য নেই। একটি ভূ-খন্ড শুধু তখনই মর্যাদা লাভ করতে

পারে যখন সেখানে খোদা প্রদত্ত জীবন–বিধান মূল বিস্তার করে। এ ভূ-খন্ডে ইসলামী আকীদা–বিশ্বাসের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ভূ–খন্ড ইসলামী আদর্শের আবাসভূমি (দারুল ইসলাম) এবং মানব জাতির আজাদী ও মুক্ত জীবন–যাত্রার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ অবস্থায় উল্লেখিত ভূ–খন্ডের প্রতিরক্ষার অর্থই হচ্ছে ইসলামী আকীদা–বিশ্বাসের সংরক্ষণ–ইসলামী জীবন–বিধান ও ইসলামী আদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী সমাজ–কাঠামোর সংরক্ষণ। কিন্তু নিছক প্রতিরক্ষা ইসলামী জিহাদের মূল ও চরম লক্ষ্য হতে পারে না। দারুল ইসলামের প্রতিরক্ষাও ইসলামী জিতাদের মূল লক্ষ্য নয়। দারুল ইসলামের প্রতিরক্ষা খোদায়ী শাসন–ব্যবস্থা কায়েম করার একটি উপলক্ষ্য মাত্র। তাছাড়া, দারুল ইসলামকে ইসলামী আলোক–বর্তিকার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা জিহাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দারুল ইসলামের কেন্দ্র থেকে ইসলামী জীবনাদর্শের আলোকোজ্জ্বল কিরণরশ্মি দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে বিস্তার লাভ করে মানুব সমাজে স্বাধীনতা ও মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করবে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, দ্বীন ইসলামের লক্ষ্য সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ এবং গোটা পৃথিবীটাই তার কর্মস্থল।

জিহাদ–ই ইসলামের প্রকৃতিগত দাবী

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, দুনিয়াতে আল্লার শাসন প্রবর্তন করার পথে কিছু পার্থিব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রচলিত সমাজ–ব্যবস্থা, অসামাজিক রাজনীতি এবং সমগ্র মানুব সমাজের পরিবেশ ইত্যাদির প্রত্যেকটিই ইসলামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব বাধা অপসারণ করার জন্যে ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে। প্রতিটি মানুষের নিকটই ইসলামের বাণী পৌছানো এবং প্রত্যেকের পক্ষে ইসলামী বিধানকে যাচাই করে দেখার প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং এভাবে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে মানুষের নিকট ইসলামের অমর বাণী

পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টিই এ শক্তি প্রয়োগের লক্ষ্য। কৃত্রিম খোদাদের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে মানুষকে স্বাধীনভাবে ভাল–মন্দ যাচাই করার সুযোগদানের জন্যে জিহাদ এক অত্যাবশ্যক উপায়।

পাশ্চাত্য লেখকগণ হিজাদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তার দরুন আমাদের বিভ্রান্ত বা ভীত হলে চলবে না। প্রতিকূল পরিবেশ অথবা বৃহৎ–শক্তিবর্গের বিরোধিতায় প্রভাবান্বিত হয়ে জিহাদের জন্যে ইসলামী জীবন–বিধানের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা অথবা জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক ও সাময়িক পদক্ষেপ আখ্যা দেয়া আমাদের কিছুতেই সঙ্গত হবে না। জিহাদ এক শাশ্বত বিধান। প্রতিরক্ষার প্রয়োজন ও সামরিক কার্যকারণ থাকুক বা না থাকুক, জিহাদের প্রয়োজনীয়তা কখনই ফুরিয়ে যাবে না। ইতিহাসের উথান–পতন সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সময় এ জীবন–বিধানের প্রকৃতি, তার বিশ্বজনীন মুক্তির ঘোষণা ও বাস্তব কর্মপন্থার মধ্যে যে ভাবধারা বিদ্যমান রয়েছে তা উপেক্ষা করা যাবে না। সামরিক কার্যকারণ ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনকে দ্বীনের মূল লক্ষ্যের সাথে সংমিশ্রিত করা হবে খুবই ভ্রান্ত পদক্ষেপ।

অবশ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা এ দ্বীনেরই দাবী। আল্লার সার্বভৌমত্বের ঘোষণা, আল্লাহ ব্যতীয় অপরের দাসত্ব থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করার বাণী প্রচার এবং এ ঘোষণা ও প্রচারের ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী আন্দোলন এবং অনৈসলামিক নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এক নতুন ধরনের নেতত্ব গড়ে তোলা এ দ্বীনের লক্ষ্য। মানুষের প্রভূত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য ঘোষণা করার সাথে সাথেই মানুষের প্রভূত্ব স্বীকারকারী জাহেলী সমাজ নিজের অস্তিত্ব বহাল রাখার জন্যে ইসলামের উপর প্রবলভাবে আক্রমণ করে। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী আন্দোলন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার

জন্যে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। ইসলামী আন্দোলনের সূচনাতেই এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইসলাম এ ধরনের সংঘর্ষ পসন্দ করে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। কেননা ইসলামী আন্দোলনের উপর এ ধরনের সংঘর্ষ চাপিয়ে দেয়া হয়। দুটো পরস্পর বিরোধী জীবনাদর্শের সহাবস্থান সম্ভবপর নয় বিধায় এদের নিজ নিজ অস্তিত্ব বহাল রাখার তাগিদই তাদের সংঘর্ষে লিপ্ত করে দেয়। এ বাস্তব সত্যের কারণেই ইসলামের পক্ষে প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

জাহেলিয়াতের সাথে কোন আপোষ নেই

ইসলামী জীবন বিধানের অপর একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, প্রকৃতিগতভাবেই ইসলাম সমগ্র মানুব জাতিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে সংকল্পবদ্ধ। তাই এ জীবন-বিধান নিজেকে ভৌগোলিক গোত্রীয় অথবা অন্য কোন সীমাবদ্ধ গন্ডিতে আবদ্ধ করে সমগ্র দুনিয়ার মানব গোষ্ঠীকে অন্যের দাসত্বে ছেড়ে দিতে পারে না। ইসলামের বিরোধী মহল কোন কে সময়ে কৌশল হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার বিনিময়ে নিজেদের এলাকায় জাহেলী সমাজ-ব্যবস্থা জারি রাখা এবং ইসলামের পক্ষ থেকে তাদের এলাকায় মানবতার মুক্তিসনদ ইসলাম প্রতিষ্টার অভিযান মুলতবী রাখার আবেদন করতে পাারে। ইসলাম এ জাতীয় 'যুদ্ধ-বিরতি' গ্রহণ করবে না। অবশ্য বিরোধী মহল যদি ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে জিজিয়া কর প্রদানের সম্মত হয়ে যায় তাহলে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা হবে। কারণ এমতাবস্থায় তারা ইসলামের বাণী প্রচারের পথে রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা বাধা সৃষ্টি না করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এ দ্বীনের প্রকৃতিই এরূপ। আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের ঘোষণা এবং দুনিয়ার সর্বত্র তাঁরই বন্দেগী কায়েম করার অভিযান পরিচালনাই তার কর্মপন্থা। একটি

ভৌগোলিক এলাকা থেকে এ আন্দোলনের সূচনা এবং একটি ভৌগলিক জাতীয়তায় নিজেকে সীমিত করা এ কথা নয়। প্রথমাবস্থায় এ ভূ-খন্ড একটি গতিশীল বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল এবং দ্বিতীয় অবস্থায় জাতীয় রাষ্ট্র সকল প্রকার বিপ্লবী কর্মতৎপরতা থেকে বিরত একটি নিষ্ক্রিয় ভূ-খন্ড মাত্র।

ইসলামের বিপ্লবী ভূমিকা উপলব্ধি করতে হলে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম মানুষের জন্যে প্রদত্ত খোদায়ী বিধান। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা গোত্র এ বিধান রচনা করেনি। তাই ইসলামী জিহাদের যৌক্তিকতার স্বপক্ষে কোন বাহ্যিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। যারা এ জাতীয় কারণ অনুসন্ধান করে তারা ভুলে যায় যে, দুনিয়াতে আল্লার নির্দেশিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃত্রিম খোদাদের উচ্ছেদ সাধন এ দ্বীনের কর্মসূচীরই অংশ। ইসলামী জীবনাদর্শের এ বিপ্লবী কর্মসূচী যাদের অন্তরে জাগ্রত থাকে তাদের পক্ষে জিহাদের সমর্থনে বাহ্যিক কার্যকারণ অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজনই হয় না।

ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে দু'রকম ধারণা

প্রথম স্তরেই ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে দু'রকম ধারণার পার্থক্য অনুভব করা সম্ভব নয়। একটি ধারণা হচ্ছে এই যে, ইসলামকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। কারণ তার আত্মপ্রকাশই জাহেলিয়াতকে ইসলামের প্রতি আক্রমণ চালাতে বাধ্য করে আর ইসলাম তদবস্থায় আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়। অপর ধারণাটি হচ্ছে এই যে, ইসলাম নিজেই অগ্রসর হয়ে জাহেলিয়াতের প্রতি আঘাত হানে এবং পরিশেষে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। চিন্তার প্রাথমিক স্তরে এ উভয় ধারণার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। কেননা, উভয় ধারণাই ইসলামকে যুদ্ধক্ষেত্রে

অবতরণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর বুঝা যাবে যে, উভয় চিন্তাধারার ধারকগণ ইসলামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে যে ধরনের ভাবধারা পোষণ করে তার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

ইসলামকে একটি খোদা প্রদত্ত জীবন–বিধান হিসেবে গ্রহণ করা এবং অপর দিকে একটি আঞ্চলিক মতবাদ বিবেচনা করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত ধারণা অনুসারে ইসলামী জীবন–বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে খোদা তায়ালার দুনিয়ায় খোদায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা, সকল মানুষকে এক আল্লার দাসত্ব করার জন্যে আহবান করা এবং এ ঘোষণার বাস্তব নমুনাস্বরূপ এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে মানুষ সম্পূর্ণরূপে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব মেনে নিতে পারে। ঐ সমাজে শরীয়তের–ইলাহীই সর্বোচ্চ বিধান। এটিই ইসলামের প্রকৃতরূপ এবং ইসলামই তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে বাধাদানকারী সকল শক্তির মূলোৎপাটন করতে নির্দেশ দেয়। কারণ ঐ উপায়েই মানুষের মনগড়া শাসন–ব্যবস্থা ও সামাজিক বন্ধনের নাগপাশ থেকে মানব সমাজের মুক্তি সম্ভব। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে ইসলামকে একটি আঞ্চলিক মতবাদ বিবেচনা করার দরুন সে বিশেষ ভূ–খন্ডের অধিবাসীদের উপর বিদেশী শক্তির আক্রমণের পর সে অঞ্চলের জনগণ আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধ করতে বাধ্য। এ উভয় ধারণার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য উভয় অবস্থায়ই ইসলাম জিহাদের নির্দেশ দেয়। কিন্তু উল্লেখিত দুটি ধারণার বশবর্তী হয়ে দুটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে জিহাদের সূচনা হলে উভয়ের কার্যকারণ, লক্ষ্য ও ফলাফল মৌলিক দৃষ্টিভংগী ও বাস্তব কর্মপন্থার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে বাধ্য।

অবশ্য ইসলাম অগ্রবর্তী হয়ে জিহাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলাম কোন দেশ বা জাতির সম্পত্তি নয়। খোদা প্রদত্ত এ জীবনাদর্শ সমগ্র দুনিয়ার কল্যাণ সাধনের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই যেসব সমাজ–

ব্যবস্থা ও রীতি–নীতি মানুষের আজাদী হরণ করে মানবতাকে দাসত্বের শিকলে বেঁধে রেখেছে সেগুলো মিটিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরী। ইসলাম জনগণের উপর আক্রমণ করে না– কারো উপর জোর করে নিজের আদর্শ চাপাতে চায় না। তার বিরোধ হচ্ছে রীতি–নীতি ও মতবাদের সাথে। রীতি–নীতি ও মতবাদের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমেই মানব সমাজকে ভ্রান্ত আদর্শের বিষাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার দাসত্বে নিয়োগ করার লক্ষ্য থেকে ইসলাম কখনো বিচ্যুত হতে পারে না। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষকে পরিপূর্ণরূপে আজাদীর স্বাদ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। ইসলামী জীবনাদর্শের মৌলিক বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মসূচী–এ উভয় দিক থেকেই একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষের সত্যিকার আজাদী অর্জিত হতে পারে। শাসক ও শাসিত, সাদা–কালো, ধনী–দরিদ্র, নিকটাত্মীয় অথবা অনাত্মীয় সকলের জন্যে একমাত্র আল্লার আইনই নিরপেক্ষ ও কল্যাণকর হতে পারে। সকল শ্রেণীর মানুষকেই এ আইন সমানভাবে মেনে চলতে হবে। অপরাপর জীবন–বিধানে মানুষ মানুষের দাসত্ব করে থাকে। আইন প্রণয়ন খোদায়ী শক্তির একটি অংশ। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানুষের জন্যে আইন রচনার অধিকার দাবী করে, তারা প্রকারান্তরে খোদায়ীর দাবী করে থাকে। মুখে এরূপ দাবী উচ্চারিত হোক বা না হোক বাস্তবে আইন রচনার অধিকার দাবী খোদায়ীর দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়।

জিহাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত ধারণা

আমাদের মুসলিম লেখকগণের মধ্যে যারা বর্তমান যুগের অবস্থা ও পাশ্চাত্য লেখকদের ছলনাপূর্ণ সমালোচনায় বিভ্রান্ত, তারা ইসলামী জীবনাদর্শের এ বিপ্লবী ভূমিকা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন। পাশ্চাত্য লেখকগণ ইসলামকে একটি রক্ত–পিপাসু আদর্শরূপে চিত্রিত করেছে।

তারা বিশ্ববাসীকে বুঝাতে চায় যে, ইসলাম তরবারির সাহায্যে অপরের উপর নিজের আদর্শ চাপিয়ে দিতে চায়। অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, ইসলাম এরূপ নয়। তবু তারা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইসলামী জিহাদের মূল সূত্র ও কার্যকারণগুলোকে বিকৃত করতে চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য লেখকদের এ জাতীয় প্রাচারণায় প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের কোন কোন মুসলমান লেখকও ইসলামের ললাট থেকে জিহাদের 'কলঙ্ক-চিহ্ন' ধুয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে ময়দানে নেমেছেন এবং জটিল যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছেন যে, ইসলামী জিহাদ নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ মাত্র। অথচ তারা ইসলামী জীবন-বিধানের প্রকৃতি ও মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা এটুকুও জানেন না যে, বিশ্বের একটি কল্যাণকামী মতাদর্শ হিসেবে অগ্রবর্থী পদক্ষেপ গ্রহণ ইসলামের প্রকৃতিগত চাহিদা। অপর জাতির দ্বারা প্রভাবান্বিত মনোবৃত্তিসম্পন্ন তথাকথিত গবেষকগণের মন-মানসে ধর্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাধারাই সক্রিয়। পাশ্চাত্যদের বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, ধর্ম একটি বিশ্বাসের নাম এবং তা স্থান মানুষের অন্তরে, বাস্তব কর্ম জীবনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ইসলাম কখনো উল্লেখিত ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়নি। আর পাশ্চাত্যের অনুরূপ আকীদা-বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কখনো জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করা হয়নি। ইসলাম মানব জীবনের জন্যে খোদা-প্রদত্ত বিধান। এ জীবন-বিধান একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই দাসত্ব ও আনুগত্য শিক্ষা দেয়। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে খোদা তায়ালার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার নিদর্শন। মানব জীবনের বড় বড় সমস্যা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের অতি ছোট-খাট বিষয় পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান করা ইসলামেরই পক্ষে সম্ভব। এ খোদায়ী ব্যবস্তাকে বিজয়ী আদর্শরূপে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই জিহাদ। তবে ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে। মানুষের মতামত পোষণ ও গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা যারা স্বীকার করে না ইসলাম তাদের

প্রতিবন্ধকতা দূর করে আপন আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চায়। ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকেরই যে কোন আকীদা–বিশ্বাস ও মতামত গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা রয়েছে। একথা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্যের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে আকাশ–পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। তাই যেখানেই ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তব নমুনাস্বরূপ কোন সমাজ গঠিত হয়ে যায়, সেখানে খোদা প্রদত্ত অধিকারের বলেই জনগণের কর্তব্য হবে অগ্রবর্তী হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা এবং ইসলামী জীবন–বিধান বাস্তবায়িত করা। অবশ্য ব্যক্তিগত আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে ইসলাম যে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করে, তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামের সূচনায় মুসলিম উম্মতকে সাময়িকভাবে আল্লাহ তায়ালা জিহাদ থেকে বিরত রেখেছিলেন। সেটা ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ বিশেষ–নীতিগত সিদ্ধান্ত তা নয়। এ আলোচনার আলোকেই আমরা কোরআনের জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলোর মর্ম অবগত হতে পারবো। কারণ ক্রম অগ্রসরমান ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আয়াত নাজিল হয়েছিল এসব আয়াতের পর্যালোচনাকালে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আয়াতগুলো দু'ধরনের প্রয়োজন পূরণ করছে। আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে যেসব আয়াত নাজিল হয়েছিল সেগুলোর মর্ম উদ্ধার করার জন্যে সে স্তর ও পটভূমি স্মরণ রাখা দরকার। আয়াতের অপর একটি দিক হচ্ছে এগুলোর স্থায়ী শিক্ষা। এ স্থায়ী শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কোন অবস্থাতেই পরিবর্তনীয় নয়। ইসলামী আন্দোলন পরিচালনাকালে কোরআনের নির্দেশাবলী থেকে পথের সন্ধান পেতে হলে আয়াত ও কোরআনের নির্দেশগুলোর উপরোল্লেখিত দু'টি প্রকৃতির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেললে চলবে না।

সমাপ্ত